বাংলাদেশের খনিজ ও শক্তি সম্পদ
(Mineral and Energy Resources of Bangladesh)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

এক বা একাধিক উপাদানে গঠিত যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মে তৈরি হয়ে শিলাস্তরে সঞ্চিত থাকে তাকে খনিজ বলে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার শিলার উপাদানসমূহ ভূ-তাত্ত্বিক সময়ের উপর নির্ভর করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। যেমন- আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, গ্রাভেল, কঠিন শিলা, গ্লাস স্যান্ড, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, সোনা, রূপা, হীরা, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- শক্তি সম্পদ, অধাতব এবং ধাতব খনিজ। খনিজ সম্পদ অনবায়নযোগ্য সম্পদ। অন্যদিকে শক্তি সম্পদ খনিজ সম্পদের অংশবিশেষ। প্রাকৃতিক বা মানুষের দ্বারা রূপান্তরের মাধ্যমে খনিজ সম্পদসমূহকে শক্তি সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- কয়লা, খনিজ তেল এবং জলবিদ্যুৎ। এছাড়াও কাঠ, গ্যাস, সূর্যরশ্মি এবং পরমানুকে শক্তি সম্পদ বলা হয়। শক্তি সম্পদ নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য উভয় প্রকার হতে পারে। এই ইউনিটে বাংলাদেশের খনিজ ও শক্তি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১: কয়লা উৎপাদন ও বণ্টন
পাঠ ৮.২: খনিজ তেল উৎপাদন ও বণ্টন
পাঠ ৮.৩: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বণ্টন
পাঠ ৮.৪: অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অধাতব খনিজ সম্পদ

পাঠ-৮.১ কয়লা উৎপাদন ও বণ্টন (Coal Production and Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহ মানচিত্রে দেখাতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের কয়লার উৎপাদন বর্ণনা করতে পারবেন।

কয়লা উৎপাদন ও বণ্টন

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধান পাঁচটি কয়লা খনিতে প্রধানত তিন ধরনের কয়লা পাওয়া যায়। যথা-বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট। বিটুমিনাস ও লিগনাইট শ্রেণির কয়লায় ছাই ও গন্ধকের পরিমাণ বেশি এবং কার্বনের পরিমাণ খুবই কম। পীট কয়লার উদ্ভব হয় উদ্ভিদ হতে কয়লায় পরিণত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে। নিম্নে বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ৮.১.১) :

খালাসপীর কয়লাক্ষেত্র : ১৯৮৯-১৯৯০ সালে রংপুর জেলার খালাসপীর কয়লাক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয়। এই কয়লাক্ষেত্রটির আয়তন ১২.৫৬ বর্গকিলোমিটার এবং কয়লা স্তরের গভীরতা ২৫৭ হতে ৪৮৩ মিটার। খালাসপীর কয়লা ক্ষেত্রটির বিস্তৃতি ১২.৫৬ বর্গকিলোমিটার। এই খনিতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন।

বড় পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র : দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়ায় বড় পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রটি ১৯৮৬-৮৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। এই কয়লা ক্ষেত্রটির বিস্তৃতি ৫.২৫ বর্গকিলোমিটার যা ছয়টি স্তরে বিভক্ত। এই খনি থেকে দৈনিক প্রায় ৫০০ টন এবং বছরে ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন হয়। এখানে উত্তোলিত কয়লার অধিকাংশই বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। এই খনিতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন।

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র : ১৯৬২ সালে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এই কয়লাক্ষেত্রটির বিস্তৃতি ১১.৬৬ বর্গকিলোমিটার এবং কয়লা স্তরের গভীরতা ৬৪০ থেকে ১,১৫৮ মিটার। জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১০৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন।

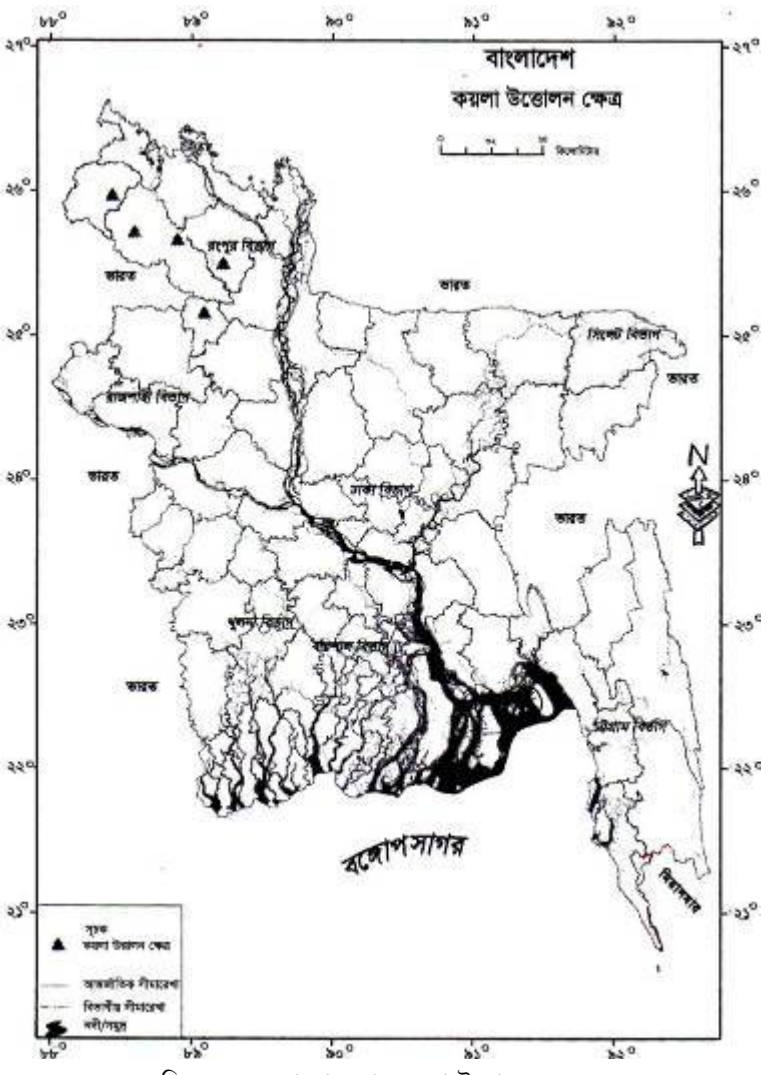

চিত্র- ৮.১.১: বাংলাদেশের কয়লা উত্তোলন ক্ষেত্র

দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র : ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে দিনাজপুর জেলার দিঘীপাড়ায় এই কয়লাক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এই কয়লাক্ষেত্রে কয়লা স্তরের গভীরতা ৩২৮ হতে ৪০৭ মিটার। দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি।

ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র : ১৯৯৭ সালে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী নামক স্থানে ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অন্যান্য কয়লাখনিসমূহ : উল্লিখিত প্রধান পাঁচটি কয়লা ক্ষেত্র ছাড়াও বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামের কুচমা, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জেও কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলাবিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস এবং লিগনাইট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কয়লাকে শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কল-কারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ চলাচল, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি হিসাবেও কয়লা ব্যবহৃত হয় । নিম্নে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার দেখানো হলো (সারণি ৮.১.১)।

সারণি- ৮.১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার

সাল	কয়লা ('০০০' টন)
২০১০-১১	৪৪৯
২০১২-১৩	৫৯০
২০১৩-১৪	৫৩৯
২০১৪-১৫	৫২২

সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ, ২০১৬

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে কয়লা খনিসমূহ প্রদর্শন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের (বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট) কয়লা পাওয়া যায়। প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহ হলো-খালাসপুর, বড় পুকুরিয়া, জামালগঞ্জ, দিঘীপাড়া ও ফুলবাড়িয়া। এছাড়াও বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামের কুচমা, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে প্রধানত কত ধরনের কয়লা পাওয়া যায়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিলে কোন ধরনের কয়লা পাওয়া যায়?
(ক) পীটজাতীয় (খ) লিগনাইট জাতীয় (গ) বিটুমিনাস (ঘ) লিগনাইট ও পীট

পাঠ-৮.২ খনিজ তেল উৎপাদন ও বণ্টন (Mineral Oil Production and Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের খনিজ তেল উৎপাদন ও বণ্টন বর্ণনা করতে পারবেন।

খনিজ তেল

খনিজ তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদ। খনিজ তেলকে পরিশোধন করে গ্যাসোলিন, ডিজেল গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল, প্যারোফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। পেট্রোল ও ডিজেল বিমান, জাহাজ, রেলগাড়ি এবং মোটরগাড়ি (বাস, ট্রাক, কার, হুন্ডা) চালাতে এবং কল-কারখানায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের তেল অনুসন্ধান : ১৯১০ সালে এদেশে প্রথম তেল অনুসন্ধান করা হয়। ১৯১০ সাল হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে ব্রিটিশ সরকারের নেতৃত্বে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম প্রোসপ্যাক্টিং কোম্পানি তেল অনুসন্ধান করে এবং ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯১৪ হতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বার্মা তেল কোম্পানি অনুসন্ধান চালায় এবং কোনো তেল খনি পায়নি। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশি ৬টি কোম্পানি উপকূলবর্তী এবং মূল ভূ-খণ্ডে কোন তেলখনি আবিষ্কার করতে পারেনি। তথাপি বাংলাদেশের পেট্রোবাংলা কোম্পানি তেল অনুসন্ধান কার্য অব্যাহত রাখে এবং দুটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে (চিত্র ৮.২.১)। যথা-

১. হরিপুর তেলক্ষেত্র : ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে এ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে হরিপুর তেলক্ষেত্র হতে দৈনিক পরীক্ষামূলকভাবে ৬০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনো তেল উত্তোলন শুরু হয়নি তবে শীঘ্রই তেল উত্তোলন শুরু হবে।

২. বরমচাল তেলক্ষেত্র : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে দ্বিতীয় তেল ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এই ক্ষেত্র

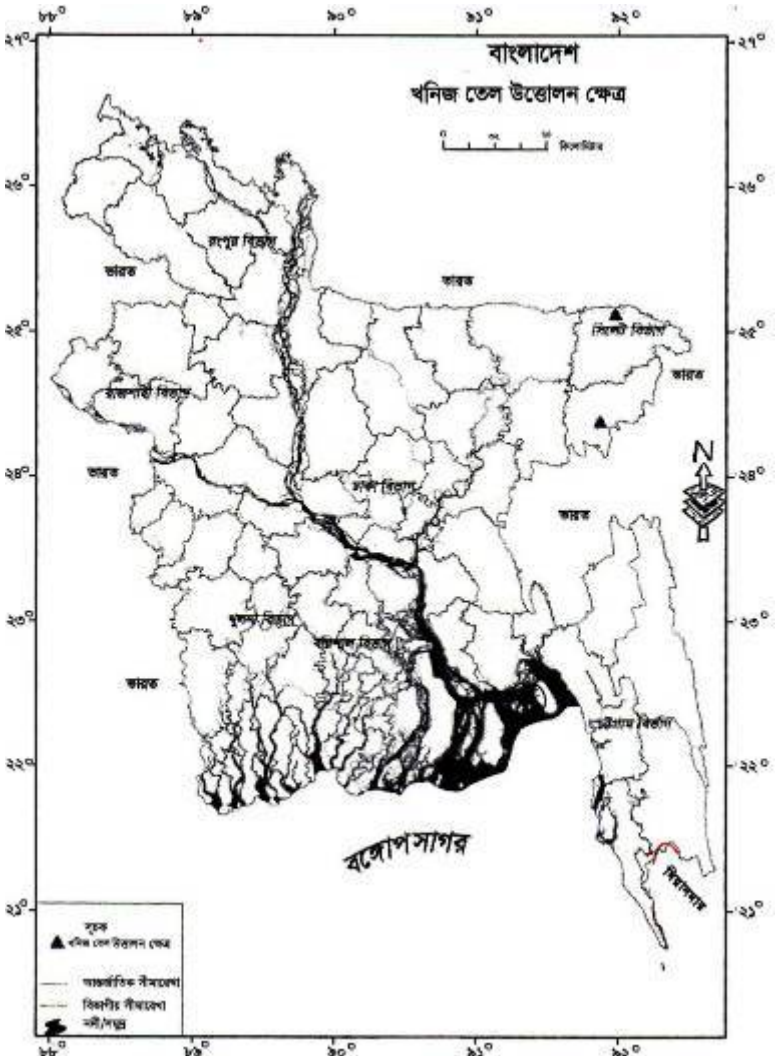

চিত্র ৮.২.১: বাংলাদেশের খনিজ তেল ক্ষেত্র

হতেও পরীক্ষামূলকভাবে দৈনিক প্রায় ১২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়। এখনো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উত্তোলন শুরু হয়নি।

৩. গ্যাস খনি হতে প্রাপ্ত তেল : বাংলাদেশের কৈলাশটিলা ও হরিপুর গ্যাস খনি হতে অতি অল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। এই তেলকে 'কনডেনসেট' বলা হয়। কৈলাশটিলা থেকে প্রতি ১০ লক্ষ ঘনফুট গ্যাসের সাথে ১০ ব্যারেল এবং হরিপুর গ্যাস খনি হতে প্রতি ১০ লক্ষ ঘনফুট গ্যাসের সাথে ২০ ব্যারেল কনডেনসেট উত্তোলিত হয়।

অন্যান্য সম্ভাব্য তেলখনিসমূহ : বাংলাদেশের বরিশাল জেলার হিজলা, মুলাদি, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, নাটোর জেলার নিমগাঁ, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এবং বগুড়ায় তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ টন। ইস্টার্ণ রিফাইনারির নতুন ইউনিট স্থাপন করলে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ লক্ষ টন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রধান দুটি তেল ক্ষেত্র মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ

খনিজ সম্পদের মধ্যে তেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদ। বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন এখনো শুরু হয়নি তবে পরীক্ষামূলকভাবে হরিপুর এবং বরমচাল তেলক্ষেত্র হতে দৈনিক যথাক্রমে ৬০০ এবং ১২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়। হরিপুর এবং বরমচাল প্রধান দুটি তেলক্ষেত্র ছাড়াও সম্ভাব্য তেলখনিসমূহ হলো নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, নাটোর জেলার নিমঁগা, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, বরিশাল জেলার হিজলা, মূলাদি প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে মোট কয়টি তেলখনি হতে পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলিত হয়?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে কী ধরনের খনি রয়েছে?
(ক) কয়লা (খ) প্রাকৃতিক গ্যাস (গ) তেল (ঘ) চুনাপাথর

পাঠ-৮.৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বণ্টন (Natural Gas Production and Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বণ্টন বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বণ্টন

প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য খনিজ শক্তি সম্পদ। যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ পূরণ করে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে (চিত্র ৮.৩.১)। তন্মধ্যে রূপগঞ্জ, কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র উৎপাদনে যায়নি। ছাতক, সাঙ্গু এবং ফেনী গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন স্থগিত রয়েছে। সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। নিম্নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্যাস ক্ষেত্রের বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **তিতাস গ্যাসক্ষেত্র :** বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নামক স্থানে ১৯৬২ সালে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং প্রাথমিক মোট মজুদ ৮১৪৮.৯ বিলিয়ন ঘটফুট এবং প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ ৬,৩৬৭ বিলিয়ন ঘনফুট। এই খনি হতে প্রাপ্ত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৬.২৭%। সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, আশুগঞ্জের সার কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশালের সার কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে উত্তোলিত গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ১৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী আবাসিক ও শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে মোট কূপের সংখ্যা ২৪টি এবং এটি সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র।

২. **বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র :** ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলার বাখরাবাদ নামক স্থানে বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে প্রাথমিক মোট মজুদ ছিল ১৭০১ বিলিয়ন ঘনফুট এবং প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ ১২৩১.৫ বিলিয়ন ঘনফুট। এই গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৩.৮৯%। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র হতে ২২ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ১৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের সাহায্যে চট্টগ্রাম শহর ও শহরের শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও গ্যাস লাইন হতে কুমিল্লা ও ফেনীতে গ্যাস সরবরাহ করা হয় এবং চাঁদপুর, লাকসাম, সীতাকুন্ড প্রভৃতি স্থানে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রের কূপের সংখ্যা ৬টি।

৩. **হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র :** ১৯৬৩ সালে হবিগঞ্জ জেলায় এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করা হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রে সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ ৩৮৫২.৩০ বিলিয়ন ঘনফুট। মিথেনের পরিমাণ ৯৭.৮%। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র হতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ২.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে শাহজীবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১২ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে কূপের সংখ্যা ০৭টি।

৪. **হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র :** ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুর নামক স্থানে হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। উৎপাদিত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৯.০৫%। ৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ ও ৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

৫. **কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র :** ১৯৬২ সালে সিলেটের গোপালপুর গ্রামের নিকট কৈলাশটিলাতে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। কৈলাশটিলায় ২০১৫-১৬ সালে প্রাথমিক মোট মজুদ ছিল ৩৬১০ বিলিয়ন ঘনফুট এবং প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ ২৭৬০ বিলিয়ন ঘনফুট ও তাতে মিথেনের পরিমাণ ৯৫.৭০%। কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে বছরে প্রায় ২১৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস উত্তোলিত হয়। এই গ্যাসক্ষেত্র হতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রে কূপের সংখ্যা মোট ৫টি।

৬. **ছাতক গ্যাসক্ষেত্র :** সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে ১৯৫৯ সালে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রে প্রাথমিক মোট মজুদ ১০৩৯ বিলিয়ন ঘনফুট এবং প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ ৪৭৪ বিলিয়ন ঘনফুট। সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ৪৭৩.৯০ বিলিয়ন ঘনফুট। ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে মিথেনের পরিমাণ ৯৮.২০%। ছাতক সিমেন্ট কারখানায় ছাতক গ্যাসক্ষেত্র হতে ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ১৯ কি.মি. দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন স্থগিত রয়েছে।

সারণি ৮.৩.১ : প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রসমূহের প্রাথমিক মজুদ ও উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাসক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ
তিতাস	২৪	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪	২৬৩৩
বাখরাবাদ	৬	১৭০১	১২৩১.৫
নরসিংদী	২	৩৬৯	২৭৬.৮
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯
সিলেট	২	৩৭০	৩১৮.৯
কৈলাশটিলা	৫	৩৬১০	২৭৬০
রশিদপুর	৫	৩৬৫০	২৪৩৩
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	২০৩
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	২৭৯
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩	৩৮১
শাহবাজপুর	৩	৬৭৭	৩৯০
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	৩১৭.৭
সুন্দলপুর	০	৬২.২	৩৫.১
শ্রীকাইল	৩	২৩০	১৬১
বেগমগঞ্জ	০	১০০	৭০
জালালাবাদ	৭	১৪৯১	১১৮৪
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩	৪২৮
বিবিয়ানা	২৬	৭৪২৭	৫৭৫৪
বাঙ্গুরা	৫	১১৯৮	৫২২
মোট	১০৯	৩৫৭১০.৬	২৫৮১৪.০৯
উৎপাদনে যায় নাই			
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫
রূপগঞ্জ		৪৮.০	৩৩.৬
মোট		১১৩.০	৭৯.১
উৎপাদন স্থগিত			
সাঙ্গু		৮৯৯.৬	৫৭৭.৮
ছাতক		১০৩৯.০	৪৭৪.০
কামতা		৭১.৮	৫০.৩
ফেনী		১৮৫.২	১২৫
মোট		২১৯৫.৬	১২২৭.১
সর্বমোট	১০৯	৩৮০১৯.২০	২৭১২১.১০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ : ১৩৩)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রসমূহের গ্যাস অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের কারণ এতে মিথেনের পরিমাণ ৯৪-৯৯% হওয়ায় পরিশোধন ছাড়াই এই গ্যাস ব্যবহার করা যায়।

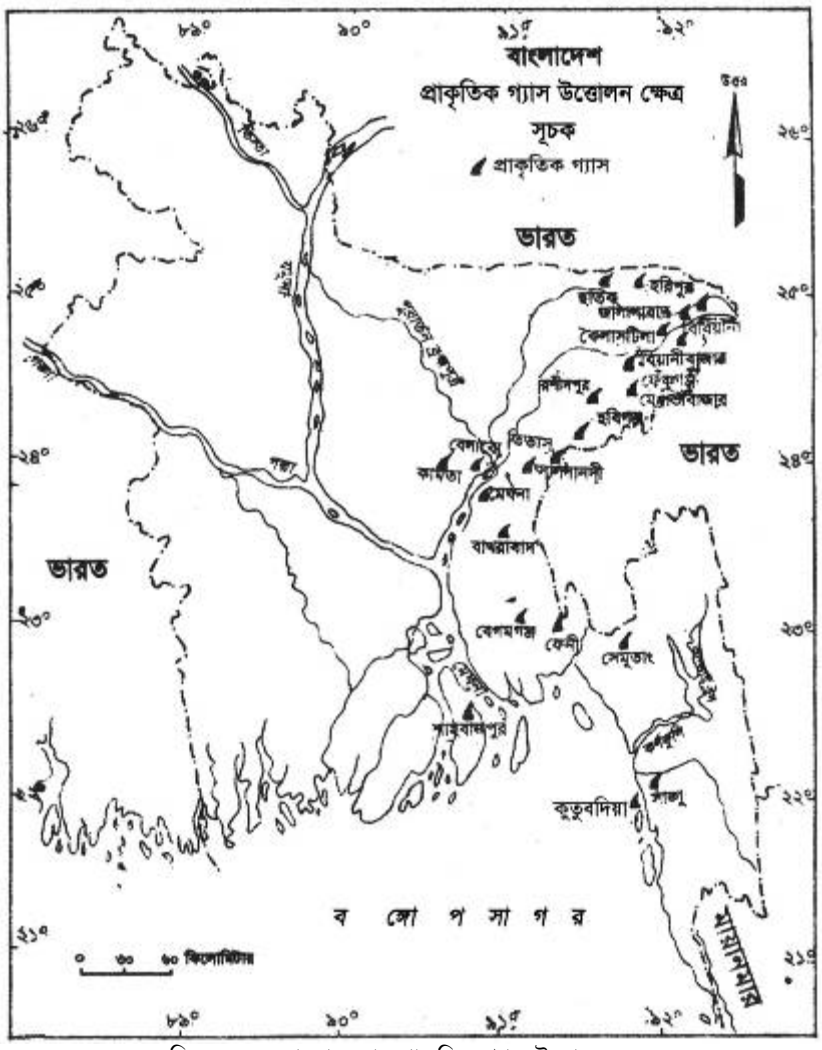

চিত্র ৮.৩.১: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ক্ষেত্র

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ শক্তিসম্পদ। বাংলাদেশে মোট গ্যাসক্ষেত্র ২৩টি। এগুলো হলো- বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো, মেঘনা, সাঙ্গু, সালদানদী, জালালাবাদ, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা, শাহবাজপুর, বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া, সেমুতাং ও ছাতক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্যাস সঞ্চিতির দিক থেকে কোন গ্যাসক্ষেত্রটি প্রথম?
(ক) তিতাস (খ) হবিগঞ্জ (গ) কৈলাশটিলা (ঘ) বেলাবো

২। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ২০ টি (খ) ২১ টি (গ) ২২ টি (ঘ) ২৩ টি

পাঠ-৮.৪ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অধাতব খনিজ সম্পদ (Other Non-Metallic Minerals)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অধাতব খনিজ সম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

অধাতব খনিজ সম্পদ

কয়লা, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ হলো- চুনাপাথর, সিলিকা বালু, চীনামাটি কঠিন শিলা, নুড়ি পাথর, ইউরেনিয়াম, আকরিক, নুড়ি পাথর ও গন্ধক ইত্যাদি (চিত্র ৮.৪.১)। এগুলো সবই অধাতব খনিজ সম্পদ। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীর হাট ইউনিয়নের চাকুপাড়া-মাসিদপুরে চুনাপাথর ও লৌহ আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এবং যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, পৃষ্ঠা-১৪২)। নিম্নে বাংলাদেশের আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ এবং এর পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ৮.৪.১ : বাংলাদেশের আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ এবং এর পরিমাণ (সম্ভাব্য)

খনিজের নাম	ক্ষেত্রের সংখ্যা	পরিমাণ (সম্ভাব্য) টন
চুনাপাথর	৩+	১২৯
সাদামাটি	৩	৪০
কাঁচবালি	৫	১১৬
কঠিন শিলা	১+	১১৫+

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ (পৃ.-১৪২)

১. চুনাপাথর (Limestone) : বাংলাদেশ চুনাপাথরে সমৃদ্ধ। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, নবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ, সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ, ভাঙ্গারহাট ও চরগাঁ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ঢাকেরঘাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার চুনাপাথর পাওয়া যায়। রং ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সিমেন্ট, গ্লাস, ইস্পাত, কাগজ, সাবান এবং ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি তৈরিতে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

২. সিলিকা বালু বা কাঁচ বালু : সিলিকা বালু বা কাঁচ বালু প্রধানত কাচ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও রং, অগ্নিচুল্লির ইপ্টক এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের যে সকল জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

কুমিল্লা : বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বাতাসিয়া গ্রামে সিলিকা বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে সঞ্চিত বালুর পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ টন।

শেরপুর : শেরপুর জেলার গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী বালিজুরিতে সিলিকা বালু পাওয়া যায়। এখানে সঞ্চিত সিলিকা বালুর পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টন।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের শাহজীবাজার ও নয়াপাড়ায় সিলিকা বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে সঞ্চিত বালুর পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ টন। এই বালিতে সিলিকার পরিমাণ প্রায় ৯৭.৯৯-৯৮.৬২%

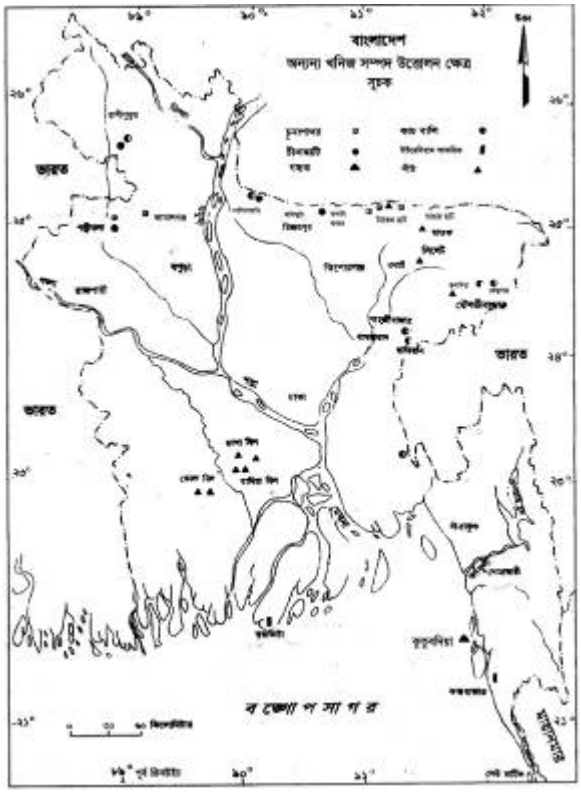

চিত্র: ৮.৪.১: বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলন

বলে কাঁচ শিল্পে এই অঞ্চলের বালু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। হবিগঞ্জ ছাড়াও মৌলভীবাজার জেলার কুলাইড়া ও সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট অঞ্চলে প্রচুর সিলিকাবালু পাওয়া যায়।

দিনাজপুর : দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানায় কয়লার উপরিভাগে কাঁচবালু পাওয়া গেছে।

৩. **চীনামাটি (China Clay) :** বাংলাদেশের দিনাজপুর, নওগাঁ ও ময়মনসিংহ জেলায় চীনামটি পাওয়া গেছে। চুনামাটি প্রধানত কাগজ, বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারি জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৪. **কঠিন শিলা বা পাথর (Hard Rock or Stone) :** বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কঠিন শিলা পাওয়া যায়। কঠিন শিলা রেললাইন, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ ও নদীর বাঁধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫. **নুড়ি পাথর** (Gravel) **:** বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়া এবং সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ ও পিয়ানগঞ্জে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। নুড়িপাথর রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, রেলপথে ও গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

৬. **ইউরেনিয়াম আকরিক :** বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া হতে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া যায়। এছাড়াও মৌলভীবাজার জেলার হাড়গাছা পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম আকরিক প্রধানত পারমাণবিক চুল্লিতে শক্তি ও পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে জন্য ইউরেনিয়াম আকরিক কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭. **গন্ধক (Sulphur) :** বাংলাদেশে শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে। সালফিউরিক এসিড, বারুদ ও কীটনাশক তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত অধাতব খনিজসমূহের ব্যবহার লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অধাতব খনিজ সম্পদসমূহ হলো-চুনাপাথর, সিলিকা বালু, চীনামাটি, কঠিন শিলা, নুড়ি পাথর, ইউরেনিয়াম ও গন্ধক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোথায় গন্ধক পাওয়া যায়?
(ক) কুতুবদিয়া দ্বীপ (খ) চেরাদ্বীপ (গ) সেন্টমার্টিন দ্বীপ ঘ) মৌলভীবাজার

২। পারমাণমিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নের কোনটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
(ক) গন্ধক (খ) নুড়ি পাথর (গ) কঠিন শিলা (ঘ) ইউরেনিয়াম আকরিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে সিলেট গিয়েছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খনিজ সম্পদ উত্তোলনকারী ক্ষেত্রসমূহ দেখিয়েছেন এবং এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
ক. খনিজ ও শক্তি সম্পদ কী?
খ. বাংলাদেশে কী কী খনিজ ও শক্তি সম্পদ রয়েছে?
গ. বাংলাদেশের মানচিত্রে সিলেট বিভাগের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করুন।
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১: ১. খ ২. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২: ১. ক ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩: ১. ক ২. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪: ১. ক ২. ঘ